OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 01 - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নৌশিল্প : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাপতির কবিতায় তার ব্যঞ্জিত শিল্প তাৎপর্য

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: ajoykumardasm2020@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Boat, Viswakarma, Rajbangshi, Salwood, Pansi boat, Madhukar, Radha Krishna Vidyapati, Radha, Krishna, Aesthetics.

Abstract
Boat is a wonderful and an essential part of human culture. Centuries of dalliance of riverine Bangladesh is prominent in ship culture. It is important to note that all this maritime art has been centered round myth-centricism, uncertainty of voyage, judging good and evil and so many like these. According to Bramhabaibartapurana, the god of these shipbuilders is Lord Biswakarma. They are poor and belong to Rajbanshi community. Just before the start of ship-building they do their daily worship and then worship Lord Biswakarma, Devi Ganga, Lord Ganesh etc. Boat is of different types. Small boats ply through canals, rivers and big ones are used for sea voyages mainly for commercial purpose, crossing long distance, fishing, war etc. Boat finds expression in Ramayana, Mahabharata, Charyapada, Srikrishna kirtan, Mangalkavya, Baisnab literature etc. The stories of commercial voyage of Chandsadagar and Dhanapati respectively in Manasa mangal and Chandi mangal are well-known creation of medieval Bengali literature. The fleet of fourteen barges of Chandsadagar is an excellent myth. Boat frequently comes in Vidyapati's poetry. He beautifully portrays Krishna as oarsman, helping Radha to cross the river. Boat is promoted with great literary value in Vidyapati's poetry. Boat, cockleboat, barge, pinnace are treated with exquisite beauty in his poetry. Boat is important part of the life of Bengal in ancient, medieval and also in modern era.

Discussion

।। ১।।

“অচিরেণৈব কালেন মেদিনী মেদিনীপতে।
ভবিষ্যতি জলে মগ্না সশৈলবনকাননা।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নৌরিয়ং সর্ব্বদেবানাং নিকায়েন বিনির্ম্মিতা।
মহাজীবনিকায়স্য রক্ষণার্থং মহীপতে।।
স্বেদাণ্ড জোদ্ভিদো যে বৈ যেচ জীবা জরায়ুজাঃ
অস্যাং নিধায় সর্ব্বাংস্তাননথান পাহি সুব্রত।।
যুগান্তবাতাভিহতা যদা ভবতি নৌর্নৃপ।
শৃঙ্গেহস্মিন মম রাজেন্দ্র তদেমাং সংযমিষ্যসি।।"[১]

এই পৃথিবী অচিরকালের মধ্যে জলমগ্ন হবে। ভগবান বিষ্ণু (মৎস্যরূপী ভগবান) মহাজীবন রক্ষার জন্য দেবতাদের দ্বারা এক নৌকা নির্মাণ করেছেন। অনাথ জীবকুলকে আসন্ন জলপ্লাবন থেকে রক্ষার আহ্বান করেছেন। মৎস্যরূপী ভগবান আরও জানালেন, এই নৌকা যখন 'যুগান্ত-বাতে অভিহত' হবে, তখন তুমি আমার এই শৃঙ্গে তাকে বেঁধে রাখবে। এভাবেই জাতির সৃষ্টি লগ্নে প্রলয় মুহূর্তে মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করেছিল, ভগবান সৃষ্ট নৌকা। মহীপতি মনুর উদ্দেশ্যে মানব জাতির ভাবী সংকট মুহূর্তে এই ছিল ভগবানের উপদেশ। 'মৎস্যপুরাণম্' - গ্রন্থে পুরাণকারেরা একথা লিখে গেছেন।

মধ্যযুগের নৌশিল্পীরা কেমন ছিলেন? ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার নৌশিল্পীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ঘরকে পূর্ণ করে রেখেছিল। বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য নৌশিল্পীরা আবহমান দারিদ্র্য জর্জর বাঙালির প্রতিনিধি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিকখন্ড'-এ নৌ 'কারিকর'দের পরিচয় রেখে গেছেন কবি। তাঁরা ছিলেন রুগ্ন - শীর্ণ - দুর্বল ও দারিদ্র্যজর্জর। বস্ত্র বিহীন তাঁরা। তাঁদের পরিধানে থাকত টেনা বা কৌপীন। শণের ডোর দিয়ে কোমরে সে কৌপীন বাঁধা থাকত। শরীরের পরতে পরতে জীর্ণতা, শত শত শিরা যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তেল বিহীন রুক্ষ চুল কেবলই বাতাসে ওড়ে। সারা শরীরে চামানি, খড়ি ওড়ে। তাঁরা কানে ভাল শোনে না, চোখে ভাল দেখতে পায় না। সামান্য বাতাসেও দাঁত নড়ে। রোগ জর্জর জীর্ণ জীবন, বার্ধক্যকালে মৃত্যুর হাতছানি। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লিখলেন -

"বসনবিহীন পর্য্যাছ কৌপীন
তথি ডোর শণ - দড়ি
শত শির গায় কেশ উড়ে বায়
অঙ্গে উড়ে তোর খড়ি।
নাহি শুন কানে না দেখ নয়নে
পবনে দশন নড়ে
ভোঁওরা - বাতে শির জাহার অস্থির
সে কেমনে ডিঙ্গা গড়ে।
জারে পীড়ে জরা জীবনে সে মরা
কথা কহ পাইআ ক্লেশ
পুত্র পরিবার কেবা আছে আর
কহ মোরে উপদেশ।
দৈন্য - দুঃখজালে এ জরাকালে
বিফল ডিঙ্গা নির্মাণে।।"[২]

এরপরেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নৌকা নির্মাণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। কবি মুকুন্দ নৌকা নির্মাণে বিশ্বকর্মার পুত্র দারুব্রহ্মেরও উল্লেখ করেছেন। আসলে দেববাদে বিশ্বাসী ভক্তিপ্রাণ হিন্দু বাঙালিরা তাঁদের প্রাণের শিল্পীদেবতাকে স্মরণ না করে শিল্পকর্মে হাত দিতেন না। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও তাঁর পুত্র দারুব্রহ্ম দুই জনে মিলিতভাবে নির্মাণ করলেন নৌকা। পিতা ধনপতি দত্তের সন্ধানে পুত্র শ্রীমন্ত সিংহল সমুদ্রের উদ্দেশ্যে সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর নয় সন্তানের মধ্যে অন্যতম এক সন্তান হলেন হলেন সূত্রধার বা ছুতোর। দেবশিল্পীর নয় সন্তানই ছিলেন শিল্পকার্যে দক্ষ। এঁরা অতিশয় শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। পৃথিবীতে নয় সন্তানকে স্থান করে দিয়ে মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে স্বর্গলোকে গমন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করেন দেবশিল্পী। কিন্তু মর্ত্যধামে নয় সন্তানই ব্রহ্মশাপ প্রভাবে পতিত হয়েছিল। সেদিনের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাঁদের নির্দেশ অনুসারে শিল্পী পুত্রদের শিল্পকার্যে নিয়োজিত হতে বাধ্য করতেন। কোন না কোন অজুহাতে শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেছেন ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিরা। সূত্রধারও ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ সূত্রধার শিল্পী যজ্ঞের কাষ্ঠ সংগ্রহে উদাসীন ছিলেন। বিলম্বজনিত কারণে কুপিত ব্রাহ্মণ্য প্রতিনিধির দ্বারা অভিশাপের জর্জর বোঝা বহন করে এঁরা পতিত নিম্নবর্গীয় ব্যক্তি- সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত হলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লিখিত আছে -

"সূত্রধারো দ্বিজানান্ত শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা।।"[৩]

পুরাণ প্রণেতারা অলৌকিক কাহিনী, দেবদেবী, অতিপ্রাকৃতে আস্থাশীল হলেও বাস্তব সমাজ-সংসার বর্জিত ছিলেন না। সেকালের ব্রাহ্মণ্য প্রতিনিধিরা পুরাণের স্রষ্টা। পুরাণ সমাজ শূন্য নয় –

"Myths also carry a social message."[৩.ক]

পুরাণকারেরা অন্য কোন গ্রহের মানুষ ছিলেন না। আমাদের এই ধূলি ধূসরিত পৃথিবীর মানুষ ছিলেন তাঁরা। মর্ত্যলোকের জীর্ণ বাস্তবতা তাঁদের সৃষ্টির আনাচে-কানাচে উঁকি দিয়েছে –

"Myths demonstrate the timeless and essential imaginative unity of the human race."[৩.খ]

সূত্রধার বা ছুতোরেরা সে কালের সমাজ সিস্টেমে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত সূত্রধার > ছুতার > ছুতোর। H.H. Risley সাহেব ছুতোরদের অন্তত প্রায় পঁচিশটি উপবিভাগ চিহ্নিত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এঁদের অন্ত্যজ জাতিরূপে সমাজে নীচুতলার মানুষ বলেই গণ্য করতেন। Risley সাহেবের গ্রন্থে এঁদের উৎস মূল পূর্ববঙ্গীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁদের বেশিরভাগ অংশ নৌকা নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেন। ব্রাহ্মণেরা এঁদের হাতে জল খেতেন না। H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' (Ethnographic Glossary (Vol.II) - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "That Shrewd observer Dr. Wise describes them as a very low caste, recruited from one of the aboriginal races of Eastern Bengal, and largely employed in boat - building. ... The Kathuria subdivision, scattered throughout the Dacca District, is engaged in cultivating the soil, building boats."[৪]

নৌকার দু'টি শ্রেণি – সাধারণ নৌকা ও মহানৌকা বা পোত নৌকা। যে নৌকা ছোটখাট নৌকা, যেগুলি খাল - বিল ও খাড়ি নদীতে চলাফেরা করে, সেগুলি সাধারণ নৌকা। আর যেগুলি সমুদ্রে চলাফেরা করে সেগুলি মহানৌকা বা পোত নৌকা। বাল্মীকি রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে 'মহানো' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুন্দরকাণ্ডের প্রথম সর্গে মহাকবি লিখেছেন -

"সমাক্ষিপ্তোহস্মি সহসা পঙ্গুকৃতপরাক্রমঃ।
প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।।"[৫]

অর্থাৎ আমি কোন ব্যক্তির দ্বারা সাগরে প্রতিকূল বায়ু - আহত হয়ে বৃহৎ নৌকার মত সহসা শক্তিহীন হলাম। মার্কণ্ডেয় পুরাণ গ্রন্থে মহানৌকা বা পোত নৌকার প্রয়োগ লক্ষণীয়। পুরাণকার লিখেছেন -

"আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।"[৬]

নৌশিল্পের প্রধান উপাদান হচ্ছে কাঠ। মহারাজ ভোজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে নৌশিল্পের সুবিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নৌকা তৈরির জন্য চার প্রকার বৃক্ষ-কাষ্ঠ-এর উল্লেখ করেছেন ভোজ। এই চার প্রকার বৃক্ষকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসন অনুসারী মনুষ্য জাতির শ্রেণি বিভাজিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে লঘু - কোমল ও সুঘট (যা সহজে অন্যের সঙ্গে যোড় লাগে), দৃঢ় - লঘু ও অঘট (যা সহজে যোড়া লাগে না), কোমল কিন্তু গুরু। এবং দৃঢ় অথচ গুরু শ্রেণির বৃক্ষ - কাষ্ঠ প্রয়োজন। এই শ্রেণিকরণ সত্ত্বেও ভোজ নৌকা নির্মাণে ক্ষত্রিয় জাতির নির্দিষ্ট কাষ্ঠ ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন-

"ক্ষত্রিয় - কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদ নৌকা।"[৬.ক]

নৌকা সাধারণত যে সব বৃক্ষের কাঠ থেকে তৈরি হয়, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল - সেগুন, শাল, আসান, গাম্ভরি বা গামার, অর্জুন, জল শিরীষ বা হলক, সুন্দরী, বাবলা, চাপ প্রভৃতি। এছাড়াও নৌকা তৈরিতে নানা উপাদান উপকরণের প্রয়োজন হয়। এগুলির মধ্যে পেরেক, তার, তুলো, সুতো, আলকাতরা, পাট দড়ি, লাইলন দড়ি, কাছি, নোঙর, হাল, পাল ও নানা কলকজা প্রভৃতি। নৌশিল্পীরা নৌকা নির্মাণে প্রয়োজনীয় নানা যন্ত্রসামগ্রী ব্যবহার করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য করাত, হাতুড়ি, বাটালি প্রভৃতি নৌশিল্পীদের একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। বংশপরম্পরা নৌশিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদী উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা নৌকা নির্মাণের প্রকৌশল আয়ত্ত করেছে। রাজবংশী জন-সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের অনেকেরই পদবি 'বারিক'। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এঁরা উক্ত পদবি লাভ করেছে।

বাংলাদেশের নৌশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পুরাণমুখিনতা, দেববাদ, যাত্রা পথের অনিশ্চয়তা জনিত শুভাশুভ বিচার, মঙ্গল - অমঙ্গল বোধ ও লোকবিশ্বাস প্রভৃতি। এছাড়া নৌকায় চিত্রিত লোকচিত্রকলায় পুরাণ প্রবণতা, পুঁথি - পঞ্জিকা বিচার, জ্যোতিষ শাস্ত্র, প্রতীকতা ও বিভিন্ন চিহ্ন, যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কার – বিশ্বাসও আছে। একথা ঠিক, পুরাণ মানব কল্পনায় শক্তিশালী দলিল –

"Powerful document of the human imagination."[৬.খ]

নৌকা নির্মাণের শুরুতে লোকশিল্পীরা প্রথম যে পুজোটি করেন, তা হল 'আহ্নিক পুজো'। শুরুতে নৌকার দাঁড়াপত্তন করা হয়। এরপর গণেশ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, গঙ্গাদেবী বা কাষ্ঠদেবী, পীরবাবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, শুভচণ্ডী, লক্ষ্মী এবং পদ্মাদেবীকে স্মরণ করে পুজো দেওয়া হয়। তবে অবশ্যই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার মূর্তি পুজোকে প্রাধান্য দিয়ে নৌকা নির্মাণ শুরু হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিল্পীরা আল্লা - রহিমকে স্মরণ করে নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নৌচিত্রকলায় পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারী চিত্র অঙ্কন করা হয়। বিভিন্ন গ্রহের দশা বিচার করে চিত্র অঙ্কন করা হয়। চিত্রণ কার্যে নৌকার জাতি বিচার করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রত্ন, রজত, তাম্র ও তিন মিলিত ধাতু ব্যবহার করা হয়। রঙের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্য জাতির নৌকায় শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের নীল রঙ ব্যবহার করা হয়-

"ধাত্বাদীনা মতো বক্ষ্যে নির্ণয়ং তরিসংশ্রয়ম্।
কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ঞ্চ যথাক্রমম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পরিণ্যস্যং নৌকা - চিত্রণ - কর্মণি।।
চতুঃশৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গবা দ্বিশৃঙ্গা চৈকশৃঙ্গিণী।
সিত - রক্ত পীত নীল - বর্ণান দদ্যাদ্ যথাক্রমম্।।"[৭]

নৌশিল্পীরা নৌচিত্র অঙ্কনে চার, তিন, দুই ও এক শৃঙ্গ ব্যবহারের নিয়ম রক্ষা করেছেন। এখানে শৃঙ্গ শব্দের অর্থ শৃঙ্গের আকার ('শৃঙ্গাকার') এমন অর্থ – অভিপ্রায় - তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করেছে বলেই মনে হয়।

সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের বিভিন্ন দশায় জাত নৃপতিদের নৌকার মুখভাগে সূর্য (রবি - মেষ রাশি), সিংহ, চন্দ্র (বৃষ রাশি), মহিষ, মঙ্গল (মকররাশি), সর্প, বুধ (কন্যারাশি), হস্তী, বৃহস্পতি (কর্কট রাশি), ব্যাঘ্র, শুক্র (মীনরাশি), পক্ষী, শনি (তুলারাশি), ভেক, রাহু (মিথুনরাশি), মনুষ্য এবং কেতুতে এঁদের মুখমণ্ডল চিত্রিত করা হয়। রাহু ও কেতুর কোন নিজস্ব ক্ষেত্র নেই। সুতরাং এঁরা কোন রাশির অধিপতি নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য নৃপতি বা জাতকের উচ্চস্থান বা তুঙ্গ স্থানের অনুসারী চিত্রের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজাদের নৌকায় কলস, দর্পণ, চন্দ্র প্রভৃতি চিহ্ন চিত্রণের কথা বলা হয়েছে -

"কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্র এব চ।
পক্ষী ভেকো মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্।।
নাবাং মুখে পরিণ্যসং আদিত্যাদিদশাভুবাম্।
কলসো দর্পণশ্চন্দ্রস্ত্রেদশানাং, মহীভুজাম্।।"[৮]

নৃপতি ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের দশাজাত সাধারণ রাজাদের নৌকার উপরে হংস, ময়ূর, শুক, সিংহ, হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র ও ভ্রমর প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করা হয় -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"হংসঃ কেকী শুকঃ সিংহো গজোহহির্ব্যাঘ্র ষটপদৌ।"[৯]

মণি ও মুক্তোতে নৌকাকে অলংকৃত করার রীতি আছে -

"নৌকাসু মণিবিন্যাসো বিজ্ঞয়ো নবদগুবৎ।"[১০]

রাজন্যবর্গের নৌকা মুক্তোমালা খচিত হয়। এমন নৌকাকে বলা হয় 'সর্বতোভদ্রা'। আর নৌকায় স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু নির্মিত মালাকে 'জয়মালা' নামে চিহ্নিত করা হয় –

"মুক্তাস্তবকৈর্যুক্তা নৌকা স্যাৎ সর্বতোভদ্রা।
কনকাদীনাং মালা জয়মালেতি গদ্যতে সদভিঃ।।"[১১]

একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট, সমগ্র মধ্যযুগ থেকে একাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে নৌকায় চিত্র প্রতিকৃতি অঙ্কন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মন্দিরে মন্দিরে পোড়ামাটির শিল্পে নৌকাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচি স্তূপে ডিঙি জাতীয় নৌকার ছবি খোদিত রয়েছে। এছাড়া বোম্বাইয়ের নিকটে সালসেটি দ্বীপের কানহেরি গুহার ভাস্কর্যে চিত্রিত নৌকা, অজন্তার নৌচিত্র, বরোবোদুরের মন্দিরের নৌ অভিযানের চিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোন কোন নৌকার উপরে ঘর তৈরি করা হয়। গৃহ অর্থাৎ ছৈ থাকে এসব নৌকায়। এগুলিকে 'সগৃহ – নৌকা' বলে। আসলে নৌকার উপরে যেন গৃহের নির্মাণ রয়েছে, এমন মনে হবে। নৌকার উপরে অবস্থান অনুসারে এগুলির নামকরণ করা হয়। যেমন - সর্বমন্দিরা, মধ্যমন্দিরা ও অগ্রমন্দিরা। নৌকার বেশিরভাগ অংশে গৃহ নির্মিত হলে সর্বমন্দিরা, মধ্য ভাগে – মধ্য মন্দিরা আর অগ্রভাগে - অগ্রমন্দিরা-

"সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্বমধ্যাগ্রমন্দিরা।"[১২]

নৌকার গৃহনির্মাণের উপকরণ কাঠ ও ধাতু – দু'ভাবে দুই ভিন্ন পদার্থে নির্মিত হতে পারে। এর মধ্যে কাঠের নির্মিত গৃহ সুখ ও সম্পদ প্রদান করে। অপরপক্ষে ধাতুনির্মিত গৃহ ভোগ ও বিলাস উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়-

"কাষ্ঠজং সুখসম্পত্ত্যৈ বিলাসে ধাতুজং মতম্।"[১৩]

ভাল নৌকা কতকগুলি বিশেষ গুণ সম্পন্ন হয়। গুণগুলি হল লঘুতা (হালকা), দ্রুতগতি সম্পন্ন, ছিদ্রহীনতা ও সমতা -

"লঘুতা দৃঢ়তা চৈব গামিতাহচ্ছিদ্রতা তথা।
সমতেতি গুণোদ্দেশো নৌকানাং সংপ্রকাশিতঃ।।"[১৪]

নৌকাকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। মহর্ষি মনুর 'মনুসংহিতা' - গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের ১৯২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, সমতল ভূমিতে রথ এবং অশ্বে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে হবে। অপরপক্ষে জল বিস্তৃত দেশে হস্তী আরোহণে নৌযুদ্ধের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নদী, সমুদ্র, বৃহৎ জলাশয় ও জল-জঙ্গলের দেশে নৌকা আদর্শ যুদ্ধোপকরণ। মহর্ষি মনু লিখেছেন -

"স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌ দ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্মায়ুধৈঃস্থলে।।"[১৫]

তবে সামান্য জলে হস্তী যুদ্ধ এবং গভীর, সুবিস্তৃত অগাধ জলে নৌযুদ্ধই বিবেচনা সম্মত। নিম্ন জলাভূমি. নদ-নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের এই বাংলাদেশ নৌযুদ্ধের আদর্শ ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হতে পারে -

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ।।"[১৬]

মহাভারতে যন্ত্রচালিত, ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, পতাকাযুক্ত ও 'সর্ববাতসহা' নৌকার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে -

"সর্ববাত সহাং নাবাং যন্ত্রযুক্তাংপতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্।"[১৭]

কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে 'নৌবিমানের' উল্লেখ রয়েছে। 'নৌবিমান' শব্দটি বিশেষ অর্থদ্যোতক। টীকাকার মল্লিনাথ 'নৌবিমান' শব্দটির অর্থ নির্দেশ করেছেন এরকম -

"নৌর্বিমানমিব' অর্থাৎ 'নৌকাখানা বিমানের তুল্য।"[১৮]

মহাকবি তাঁর মহাকাব্যে রাজা কুশের জলবিহারে ব্যবহৃত নৌকাকে বিমানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঐ নৌকাতে পরপর সাজানো সাততলা দালান ছিল। ঐ দালানে নানা চিত্র শোভিত ছিল। মহাকবি কালিদাস লিখেছেন -

"স নৌবিমানাদবতীর্য্য রেমে, বিলোলহার: সহ তাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ, করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ।।"[১৯]

নৌবিমান যে সাততলা জাহাজের মত প্রস্তুত হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই পরিচয় রেখে গেছেন প্রাচীন গ্রন্থকারেরা।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের একটি প্রাচীন বাংলা পঞ্জিকায় (কাত্যায়নী প্রেস, ৩৯/১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা) নৌকা নির্মাণের মাস ভিত্তিক শুভতিথি - নক্ষত্র ও যোগের উল্লেখ রয়েছে। রঙ্গনকান্তি জানা তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক জলযান' গ্রন্থে বিষয়টি হুবহু তুলে দিয়েছেন।[১৯.ক] যেমন- বৈশাখ মাস - তিথি - পঞ্চমী, নক্ষত্র মৃগশিরা, যোগ - শোভন। অনুরূপ, চৈত্র মাস - তিথি দ্বাদশী, নক্ষত্র - রোহিনী, যোগ - ব্রহ্ম প্রভৃতি। নৌকা নির্মাণের আগে শুভযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত স্তরে বিন্যস্ত। প্রথমত, দৈর্ঘ্য - প্রস্থ - উচ্চতা , খোলের মান, দাঁড়া (Centre Board) পত্তন ও তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সুতো দিয়ে মাপজোখ প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, খোল (hull) তৈরি ও জলতল নির্ণয় প্রভৃতি। তৃতীয়ত, তক্তার জোড় বন্ধ করা। তুলো দিয়ে তক্তার ফাঁক ফোকর পূরণ করা। এছাড়া খোলের উপর পাটাতন নির্মাণ, হাল - পাল - মাস্তল প্রভৃতি তৈরি। সর্বোপরি নবগঠিত নৌকাকে রঙ করা। নৌশিল্পীরা নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষ। মুখ্যত বারিক পদবি ছাড়াও দাস, মণ্ডল, পাল, বিশ্বাস, সাহা প্রভৃতি পদবি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং শেখ, আলি, সর্দার, হক, মিদ্যা প্রভৃতি পদবিধারী জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা নৌকা তৈরি করেন।

নৌপ্রযুক্তি বিচিত্র বিন্যাস সমৃদ্ধ। আকার ও প্রকার অনুসারে বিভিন্ন নাম চিহ্নিত। নৌকার বিশিষ্ট নামগুলি হল - পানসি, পিনিস বা বজরা, ময়ূরপঙ্খী, ভড়, কাটরা, হোলা, ঢাকা অঞ্চলের পলয়ার, নুনের নৌকা, সুন্দরবন অঞ্চলের মগ নৌকা, তমলুক অঞ্চলের নুনের নৌকা, উলাক, ভাউলিয়া, সুন্দরবন অঞ্চলের ভদ্র কুলিয়া, পাতেলা প্রভৃতি। বিভিন্ন আকৃতির পানসি তৈরি করেন স্থানিক লোকশিল্পীরা। এগুলির মধ্যে কলকাতা পানসি, কাটোয়া পানসি, হুগলি পানসি, নদিয়া পানসি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপর শুভদিন দেখে যাত্রা শুরু হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত যাত্রা সম্পর্কিত নানা লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে এক্ষেত্রে মান্যতা দেওয়া হয়। সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে -

ক. "রবিবার ও শুক্রবারে পূর্বদিকে যাত্রা শুভ হয়, সোমবার ও শনিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা অতি শুভ। মঙ্গলবারে দক্ষিণদিক এবং বৃহস্পতিবারে উত্তরদিকে অবশ্যই যাত্রা করবেন।"[২০]

খ. "দ্বিতীয়ায় যাত্রা করলে গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌঁছানো যায়, কার্যও সিদ্ধি হয়। তৃতীয়ায় যাত্রা করলে জয়লাভ, চতুর্থীতে বধ, বন্ধন ও ক্লেশ ভোগ, পঞ্চমীতে কার্যসিদ্ধি, ..."[২১]

গ. "অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যাত্রায় অতি উত্তম ফল লাভ ..."[২২]

ঘ. "ধনু, মেষ অথবা তুলা লগ্নে যাত্রা করলে দেরিতে কার্যসিদ্ধি হয়। সিংহ ও কুম্ভ লগ্নে স্থির কার্যসিদ্ধি হবে। ..."[২৩]

ঙ. "পূর্বদিকে ধনু, সিংহ ও মেষ লগ্ন উত্তম। উত্তর দিকে কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্ন উত্তম। ...বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে দক্ষিণ দিকে যাত্রায় শুভ।"[২৪]

চ. "কোন জায়গায় যাবার জন্য যাত্রা করে যদি তিন দিনের ভেতর যাওয়া না ঘটে, তবে আবার শুভদিন দেখে যাত্রা করবেন।"[২৫]

ছ. "কোন জায়গায় যাবার জন্য যাত্রা করে যদি তিনদিনের ভেতর যাওয়া না ঘটে, তবে আবার শুভদিন দেখে যাত্রা করবেন।..."[২৬]

নৌশিল্প সম্পর্কে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থটি হচ্ছে, মহারাজ ভোজের যুক্তিকল্পতরু। গ্রন্থটিতে নৌকা নির্মাণের প্রধান উপাদান কাঠের জাতি - চরিত্র এবং গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা যেমন আছে, ঠিক তেমনি লেখক নৌশিল্পীদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন, ক্ষত্রিয় জাতির কাঠ থেকে নৌকা নির্মাণই শ্রেয়। এক্ষেত্রে সুখ, সম্পদ ও প্রাচুর্য আসে -

“ক্ষত্রিয়কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজ মতে সুখ সম্পদং নৌকা।”[২৬.ক]

এছাড়াও উক্ত গ্রন্থে নৌকার আকৃতি, শ্রেণি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া নৌকা সাজানো, যাত্রীদের ব্যবহারিক আসবাব, সুখ-সুবিধা বিধানের বন্দোবস্তের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। নৌকায় অঙ্কিত চিত্রকলার বিবরণও পাওয়া যায়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘ভারতের নৌ-শিল্প’ নামের গবেষণা গ্রন্থে ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, বায়ু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, বরাহ পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত নৌকার নানা অবস্থা ও বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তীকালের সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক - যেমন কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থে নৌকার উল্লেখ আছে। এছাড়া বাণভট্টের রত্নাবলী, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, মাঘের শিশুপালবধ কাব্য, দশম শতকের কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রের ‘বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা’ গ্রন্থ, আর এক কাশ্মীরি কবি সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, এছাড়া হিতোপদেশ, ভর্ত্তিহরির নীতিশতক, কলহনের রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থে নৌ-সম্বন্ধীয় বিচিত্র তথ্য ও নৌযাত্রার চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত ছাড়াও পালি সাহিত্য ও জাতকে নৌকার উল্লেখ আছে। জাতক গ্রন্থে ‘সেরিবা ও সেরিবান’-এর আখ্যানেও নৌযানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল সাহিত্যে নয়, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং পুরানো মুদ্রাও নৌ-সংস্কৃতির প্রামাণিক দলিল। সাঁচি স্তূপ, বরোবোদুরের মন্দির, অজন্তার চিত্রাবলীর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এছাড়া পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির ও বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির গাত্রে নৌচিত্রের পরিচয় মেলে। এগুলি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিল্পকলার এক গৌরবময় যুগকে স্মরণ করায়। ‘ঋগ্বেদ সংহিতা’র সপ্তম (৭) মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের ৪ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও জলদেবতা বরুণ সাজানো গোছানো নৌকায় চড়ে মহানন্দে সমুদ্রযাত্রা করছেন। যাত্রাপথে নৌকা দোলনে অধীর। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি লিখেছেন -

“বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ।।”[২৬.খ]

ব্যাসদেবের মহাভারতে দুর্যোধন পাণ্ডব ভ্রাতাদের পুড়িয়ে মারার জন্য জতুগৃহ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ধীমান বিদুর পাণ্ডবদের আসন্ন বিপদ অনুমান করে বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে দ্রুত পলায়নের জন্য নৌকা প্রস্তত রেখেছিলেন। মহাভারতকার লিখেছেন, নৌকাটি মন ও বায়ুর মত দ্রুতগামী। সমস্ত রকমের বায়ুর প্রবল বেগ সহ্য করতে সক্ষম। নৌকাটি পতাকাযুক্ত। গঙ্গার মধ্যে অপেক্ষা করছে এমন কলের নৌকা। বিদুরের বিশ্বস্ত লোকশিল্পীরা পবিত্র গঙ্গাতীরে নৌকাটি নির্মাণ করেছিলেন। নৌকাটি জলপথে চলার উপযুক্ত ও সুখগামিনী। সেই সরল সজ্জন নৌশিল্পী পাণ্ডবদের নৌকার সাহায্যে গঙ্গা পার করে তাঁদের বিপদমুক্ত করেছিলেন। মহাভারতকার লিখেছেন -

“ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থান্ সন্দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্।।
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্।”[২৬.গ]

মহর্ষি মনুর ‘মনুসংহিতা’ গ্রন্থে নৌযাত্রা সম্পর্কিত নানা বিধি নিষেধ ও সংস্কার বিশ্বাসের উল্লেখ আছে। নৌপণ্য ওঠা নামায় লাভের সঠিক হিসেব এবং সেই অনুযায়ী রাজকর প্রদান উল্লেখযোগ্য বিধি। নদী পারাপারের সময় নৌকার সঠিক ভাড়া নির্ণয়, ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ও যাত্রীর মালপত্রের নষ্টজনিত কারণে ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি নির্ণয়, বিশেষত নৌবিমার প্রচলনের বিধির উল্লেখ করেছেন মহর্ষি। যদি নাবিকের দোষে নৌকার ক্ষতি হয়, তবে সকল নাবিককে সমানভাবে তা পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মহর্ষি। মনু আরও লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নৌকাপথে সমুদ্র পেরিয়ে দ্বীপান্তরে যাত্রা করেন, তাহলে তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেও শাস্ত্র-অনুসারী সৎকারের উপযুক্ত হতে পারবেন না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫৮ সংখ্যক শ্লোকে মহর্ষি মনু লিখেছেন -

“অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তেলিক: কূটকারকঃ।"[২৬.ঘ]

প্রাচীন ভারতবর্ষে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দরে মহানৌকা (জাহাজ) তৈরি করা হত। সে সময় ছিল সমুদ্র অভিযানের সুবর্ণ যুগ। কিংবদন্তি এরকম, বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরে নির্মিত সুবৃহৎ নৌকাতেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন। সেই নৌকাতে সৈন্য সমেত ১৫০০ জন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন নৌশিল্পে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চল কাঁথি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নৈনান, হুগলি জেলার বলাগড় প্রভৃতি অঞ্চল নৌশিল্পের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ ক্ষেত্র। ক্ষয়িষ্ণু হলেও এসব স্থানে নৌশিল্প কিছুটা টিকে আছে। শোনা যায়, এগরা থানার জামুয়া-লছিমপুর গ্রামে পুরাকালে যে নদী ছিল, সেখানে সপ্ত ডিঙা বাঁধা থাকত।

।। ২ ।।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশের অন্তর্বেদনা ভাষা পেয়েছে চর্যাপদের পাতায়। কয়েক শতাব্দী ধরে পুঁথির পাতায় মূক আত্মগোপন করেছিল বাংলা ও বাঙালির জীবন সাধনা। অবশেষে সরস্বতীর বরপুত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুক্তি দিলেন সেই উজ্জ্বল আলোকিত জীবনচর্যাকে। সাধনতত্ত্ব প্রকাশের সময়ে সিদ্ধাচার্যরা নৌকার রূপক অনায়াসে নিয়ে এসেছেন। নদ-নদী-সাগর-খাল-বিলে নৌকাই ছিল জীবন জীবিকা ও আশ্চর্য লোকযান। চাটিলপাদ লিখলেন - গভীর গহন ভবনদী বেগে বইছে, দুই ধারে তার পাঁক। ক্ষণস্থায়ী, তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাময় এ জীবন। অতএব নির্বাণের পথই শ্রেয় -

"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।"[২৭]

কামলী – (কম্বলাম্বরপাদ) লিখলেন, আমার করুণা নৌকাতে সোনা ভর্তি আছে, রূপা রাখার ঠাঁই নাই। উপমা ও রূপকের চমৎকারিত্ব। সাধকের সাধনার জগৎ -

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই মহিকে ঠাবী।"[২৮]

ডোম্বীপাদ খবর দিয়েছেন, গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা চলাচলের। ব্যঞ্জিত অর্থদ্যোতক রূপক -

"গঙ্গা জঊনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।"[২৯]

ভুসুকুপাদ লিখলেন, বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়ে পদ্মখালে বহে যায়। জীবন্ত রেখাচিত্র, বস্তু বিশ্বের রূপক, নৌকা বাওয়ার রূপক। ভবসাগরের টানা স্রোত। আর মানবের এই নশ্বর দেহ জন্মমৃত্যুর পাকে পাকে ঘুরে মরছে। জীবন মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, শূন্যের কূলে নৌকা ফেরাতে হবে -

"বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।"[৩০]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি সম্পূর্ণ খণ্ড নৌকাখণ্ড। বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যটির নামকরণ করেছেন 'অথ নৌকাখণ্ডঃ'। কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ নৌশিল্পী। তিনি শ্রেষ্ঠ নাবিক। কৃষ্ণ জাতিতে গোয়ালা। কিন্তু কাব্যে গোয়ালা বৃত্তি যেন কিছুটা উপেক্ষিত, বরং তাঁর প্রতিভার চমৎকারিত্ব নৌকা নির্মাণেই স্ফুটমান। কবি লিখেছেন -

"কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে।।
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে।"[৩১]

কৃষ্ণ নৌকা বাইতে থাকেন, দক্ষ নাবিকের মুনশিয়ানা। কবি লিখলেন -

"তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ
হেহে লহে লহে।।
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।"[৩২]

সেই সে যমুনা নদী, প্রণয়ের কঠিন রজ্জুতে নাবিক কৃষ্ণ বেঁধেছেন রাধিকাকে। এক মুঠো প্রেম? যমুনার প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে জীবন বয়ে চলেছে। মরণ অতিক্রমী সে জীবন। নৌশিল্পী কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন মহাজীবনের অধীশ্বর।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

মধ্যযুগে 'চৌদ্দ ডিঙ্গা' নিয়ে চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটনে অভিযান গৃহকোণ বিলাসী বাঙালির দুর্নাম ঘুচিয়েছে। অটল কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত, আদর্শনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা, পাষাণ সদৃশ, উচ্চতম শিখর বিশিষ্ট সেই পুরুষ চরিত্রটি চলেছেন দক্ষিণ পাটনে (দক্ষিণ বাণিজ্য)। সারি সারি চলেছে নৌকা - মঙ্গলা, চন্দ্রপাট, সিন্দূর কটুয়া, হাসমড়া, মগর, ধুতুরার ফুল, গৌরাঙ্গ (গোড়াঙ্গা), সমুদ্র উথাল (সমুদ্র উত্থাল), সুমন্তবহাল, সঙ্কুচর (শঙ্খচূড়), গরুড় মহারথী, সিংহমুখ (সিংহমুক), চন্দ্ররেখা, মধুকর - এসব নামের নৌকা, পাঠকের সেই কল্পনার স্বপ্নলোকে যাত্রা। বর্ণনার অতীত কোন নৌকায় নানা দেবতার নাম লেখা, কোনটিতে চণ্ডীর চরণ বন্দনা, কোনটিতে গঙ্গা ও শিব বন্দনা, কোনটিতে প্রতি মঙ্গলবারে কালিকার পুজো, কোনটিতে বিচিত্র ঘর, কোনটিতে রত্নের কলস শোভিত - নানা দ্রব্যে পূর্ণ এমন চৌদ্দ ডিঙা। বিজয়গুপ্ত লিখলেন -

"তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে মধুকর।
এই ডিঙ্গায়ে চড়িয়াছে চান্দো সদাগর।।"[৩৩]

সুকবি নারায়ণ দেব অবশ্য প্রথম নৌকাটির নাম রেখেছেন মধুকর। যার উপরে আছে শিব লিঙ্গের ঘর। এরপর আগল - পাগল, চন্দনপাট, টিঞাধুটী, জাত্রাবর, সুতারেখি, মাণিক্যমেড়য়া, হিঙ্গুলবাড়ি, কাজলরেখি, সঙ্খচুর, রত্নমালা, উদয়তারা, দুর্গাবর এবং শেষতম চতুর্দশটির নাম খরসান। কবি লিখেছেন, ষোলোশ দাঁড়ি মিলে এসব নৌকাতে দাঁড় বাইত -

"সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্যমেড়য়া।
উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়য়া।।"[৩৪]

জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সদাগর ছুতোর কুন্দাইকে ডেকেছেন চৌদ্দ ডিঙা প্রস্তুত করার জন্য। শিষ্যদের নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন। নৌকার জন্য বনে গিয়ে কাঠ কেটেছেন। কবি লিখেছেন -

"সরল সারল কাটে পিয়লা পিপলি।
কাটিল খজুর শাল পিয়লি সিমলি।।
চাঁপা নাগেশ্বর কাটে বকুল কাঠাল।
নিম নারিকেল কাটে জলপই তাল।।
বৃক্ষ কাটি কামিলা রাখি সারি সারি।
চিরিয়া করিল তক্তা লক্ষ তিন সারি।।
বাছিয়া বসায় তক্তা কর্ম্ম করে ভাল।
সারি সারি হানিলেক লোহার গোজাল।।
আসন বান্ধিয়া বান্ধিল জলপাট।
বান্ধিয়া ডিঙ্গার গোড়া তোলে মালকাট।।"[৩৫]

নৌশিল্পী প্রথম যে নৌকাটি বেঁধেছেন, তাঁর নাম মধুকর। পর্যায়ক্রমে এক এক করে শিল্পী নৌকা নির্মাণ করেছেন। কবি লিখেছেন -

"প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
বাঘমুঁহা ভেড়ামুঁহা ধাউর ভ্রমর।।
শীতলপাটি উভমুখী কোসার কচবন্ধ।
বান্ধিল মোহনগিরি সভার আনন্দ।।
সুবুদ্ধি জাহাদ বান্ধে কোশা পানসোই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা করে আগে বানিয়ার ঠাই।।"[৩৬]

নৌকা প্রস্তুত হল। এবার শিল্পী বিদায়ের পালা। কামারকে দিলেন অমূল্য রত্ন উপহার। চূড়ামণি দৈবজ্ঞকে ডাকালেন। তিনি পাঁজি দেখে গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি-দিন নির্ণয় করলেন। খড়ি পেতে অঙ্ক কষে দৈবজ্ঞ জানালেন, মনসার সঙ্গে বিবাদই অমঙ্গলের কারণ। হিন্দু পুরাণ ও ভারতীয় জ্যোতিষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই সেকালে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে অবশ্য সপ্তডিঙ্গা নির্মাণের কথা নেই। কবির কাব্য শুরু হয়েছে দেবী মনসার চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা ডুবানোর মন্ত্রণা দিয়ে। কিন্তু কাব্যের শেষ অংশে সওদাগরের ডিঙ্গা উদ্ধার এবং চৌদ্দ ডিঙ্গার প্রত্যাবর্তন বর্ণনা বড়ই মনোমুগ্ধকর। কবি লিখলেন -

“প্রথমে ত্রিবেণী যায় বাহি চৌদ্দ ডিঙ্গা।
গেঁঠ্যার গাবর বাহে বাজে রণশিঙ্গা।।
...
জগাতী কুকুর ঘাটা পশ্চাৎ করিয়া।
হরষেতে যায় রামা চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া।।”[৩৭]

খুল্লনা পুত্র শ্রীমন্তকে পিতার সন্ধানে সিংহল দেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীমন্তের জন্য সাত ডিঙা নির্মিত হচ্ছে। নৌকার মাপজোখ করছেন নৌশিল্পী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও তাঁর পুত্র দারুব্রহ্মের প্রাসাদলব্ধ সেই নৌকা। কবি লিখলেন -

“প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ
মকর - আকার মাথা গজেক অন্তরে বাতা
মানিকে করিল চক্ষুদান।।”[৩৮]

মুকুন্দের কাব্যে শ্রীমন্তের জন্য নির্মিত প্রথম নৌকাটির নাম মধুকর। পরপর যে নৌকাগুলির বাঁধন সম্পূর্ণ হল সেগুলি যথাক্রমে - সিংহমুখী, গুয়ারেখি, রণজয়া, রণভীমা, সর্বধরা, চন্দ্রতারা, নাটশালা - এই সাত ডিঙা। কবি লিখলেন -

“গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যে জার রইঘর
পাশে গুড়া বসিতে গাবর
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে
গোঁজে ব্যন্ধা আছে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।”[৩৯]

ভারতীয় জাতিসত্তার গৌরবচিহ্ন বহন করেছে নৌশিল্প। নৌকা সমুদ্রের অপার বিস্ময়কে মানবজাতির চেনা মহলের বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ সুন্দর করেছে। নৌকা সেই জলযান, যা সুবিপুল প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম করেছে। মানবের মানব হওয়ার সাধনপথকে নির্মাণের সৃষ্টি সৌধে নির্মল ও পবিত্র করেছে। প্রাচীনকাল থেকে মানবের অবিরাম কর্মময় সাধনার ফলশ্রুতি ও গৌরবের ইতিহাস মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

।। ৩ ।।

বিদ্যাপতির কবিতায় নৌকার প্রসঙ্গ আছে। তিনি ডিঙি নৌকা এবং জাহাজের পার্থক্য করেছেন। একটি পদে দেখা যাচ্ছে, জলে ও স্থলে সমানভাবে নৌকা চালানোয় দক্ষ মাঝি রাধাকে লাভ করতে পারেন। সেকালে নৌকা পার করানোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার কাজ বলে বিবেচনা করা হত। সমাজে মাঝি সম্প্রদায়ের কদর ছিল। কৃষ্ণের মাঝি রূপে রাধাকে নদী পের করানোর প্রসঙ্গও কবিতায় পাওয়া যায়। খেয়া পার করার জন্য পারানির কথা কবিতায় এসেছে। কিন্তু সেই পারানি মুদ্রা কিনা তো বোঝা যাচ্ছে না। নৌকায় সোনা বোঝাইয়ের কথা যেমন চর্যায় পাই, ঠিক তেমনি বিদ্যাপতির কবিতায়ও নৌকা বোঝাই করে সোনা আনার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কবি খরস্রোতা নদীতে যেমন নৌকা চালানোর কথা বলেছেন, তেমনি পণ্ডিত কবি কামনার নৌকোর কথা বলেছেন। একটি পদে দেখা যাচ্ছে, রাধা মাঝ দরিয়ায় ডুবেছেন। ডিঙি নৌকা নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা অসম্ভব। সুপুরুষ সত্যিকার প্রেমের পথ বর্জন করেন না। রাধা তাঁর প্রেমিক কৃষ্ণকে জাহাজ নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন।

কে রাধাকে লাভ করতে পারে? যিনি অঞ্জলি করে সাগর শোষণ করতে পারেন, যিনি সুরাসুরকে মেরে জয় করতে পারেন, জলে ও স্থলে সমানভাবে নৌকা চালাতে পারেন, তিনি কেবল এই নারীকে লাভ করতে পারেন। কবি লিখেছেন -

“জে চুরূ কয় সায়র সোখল

জিনল সুরাসুর মারি।
জল থল নাব সমহি সম চালএ
সে পাবএ এহি নারি।।”[৪০]

২। রাধা কৃষ্ণের গুণ, গৌরব এবং সুশীল স্বভাব জেনেই কৃষ্ণের নৌকায় চড়েছেন। কৃষ্ণকে হঠকারিতা করতে মানা করেছেন। রাধা কৃষ্ণকে নদী পের করে দিতে বলেছেন। রাধা পরনারী। সুতরাং কৃষ্ণের সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে পরোপকার করা। কবি লিখেছেন -

“তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব।।”[৪১]

৩। রাধিকা উচিত মত নিজের খেয়ার পারানি নিতে বলেছেন। অনুচিত পথ পরিহার করতে বলেছেন তিনি। কেননা, নতুন যৌবনে দুই কুলেই অপযশ হবে -

“খর কএ খেব লেহে নিঅ দান।
রসিক পএ রাখ গোপীজন মান।।”[৪২]

৪। আলোচ্য পদটিতে চমৎকারিত্ব আছে। পূর্বকালে শোনা যায়, নৌকা বোঝাই করে সোনা আনা হত। কিন্তু যে বাতাস সর্বত্র ব্যাপ্ত তাকে কুলোয় ভরে কে আনতে পারে? নায়ক নায়িকার দেহের মূল্যই নেই। হাটের ঘর যেমন দোকানদার না থাকলে অর্থ শূন্য হয়, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ না থাকলে রাধার দেহও নিরর্থক। কবি লিখেছেন-

“পছা সুনিঅ ভেলি মহাদেই
কনকে নাবে ওকান।”[৪৩]

৫। খরস্রোতা নদীর বেগে নৌকা ভাসল। বালক কানাই নৌকা সামলাতে পারল না। আর রাধা জলে পড়ে নৌকা পের হলেন। তাঁর বলয় ভাঙল, হার ছিঁড়ল। কবি লিখেছেন -

“খরি নরি - বেগ ভাসলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাই।।”[৪৪]

৬। কৃষ্ণ যদি সমস্ত বর্ষ বিদেশে যাপন করেন, তাহলে শ্রেষ্ঠ নারীর কি হবে? অপেক্ষা করেছেন রাধা। দেহ ক্ষীণতর হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। বিরহ পয়োধি আর তাতে কামনায় নৌকা।

“বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
আস ধরএ কড়হার।”[৪৫]
[কড়হার – নৌকার হাল]

৭। ডিঙি নৌকা এবং জাহাজের পার্থক্য রয়েছে পদটিতে। একাকিনী রাধিকা। রাধা অনেক দুর্ব্যবহার করেছেন কৃষ্ণকে। তা সত্ত্বেও রাধার বিশ্বাস সুপুরুষ কখনো প্রেম পরিত্যাগ করে না। ডিঙি নৌকা নদীর মাঝখানে ডুবে গেল। এখন রাধিকা জাহাজ নিয়ে তাঁকে পের করার আহ্বান জানিয়েছেন -

“ডেঙি ডুবল মঝধার রে
লৈ জহাজ করু পার রে।”
(ডেঙি - ডিঙি নৌকা)[৪৬]

।। ৪ ।।

স্রষ্টার সৃষ্টিতে বাস্তব, মিথ কিংবা কিংবদন্তি, সাহিত্যের অপরিহার্য সৌন্দর্যরূপ। এগুলি কেবল মধ্যযুগের মঙ্গল কবিদের শিল্প ফসল নয়, নয় কেবল রূপকথার মোহময় অন্তর্জাল। বাঙালির কলমে যখন গদ্য সাহিত্য ডানা মেলল, সেই পর্বে সরস্বতীর সাধক সন্তান হরপ্রসাদ পাঠককে উপহার দিলেন ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসটি। গ্রন্থটির আগাগোড়া লোকশিল্প দিয়ে মোড়া।

সরস্বতী নদীর উপরে পারাপারের কোন সাঁকো নেই, খেয়া নৌকা নেই। মহাজনী নৌকাকে লোক পারাপারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণনায় –

> "নৌকার মাস্তলগুলি নানা রঙের কাপড় দিয়া মোড়া। মাস্তলের আগা হইতেও দিকমালা ও কিঙ্কিণীমালা। আর সব নৌকাই বেশ সাজানো-গোজানো, হাতিগুলির যেমন শিঙার করে, নৌকার সেই রকম শিঙার করা হইয়াছে, কোথাও লাল, কালো, সাদা, হলুদের বড়ো বড়ো ডোরা, কোথাও হাতি - ঘোড়া আঁকা।"[৪৭]

উপন্যাসে তারাপুকুরের রূপা বাগদি সাতগাঁয়ের রাজা, তিনি গাজন উৎসব করেন। গাজন উৎসবে নৌকার উপর দিয়ে লোক পারাপার করছে। উপন্যাসের আর একটি চরিত্র বিহারী দত্ত। সাতগাঁয়ের বিহারী দত্ত বড় বণিক। পৈতৃক বিষয় - আশয় না থাকা সত্ত্বেও নিজে সমুদ্র পেরিয়ে বাণিজ্য করেছিলেন - বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। তিনিও বড় মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর একটি কন্যা রত্ন ছিল। আশ্চর্য সুন্দরী সে কন্যা। আর বেনে বৌ সমুদ্রপথে বাণিজ্যে প্রাণের আশঙ্কা থাকায় স্বামীকে বাণিজ্যে যেতে নিষেধ করতেন। অবশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর সমাজপতি ও মাথাদের আপত্তি সত্ত্বেও স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে বিহারী দত্তের ডিঙ্গা ভাসল। একেবারে সাত সাতখানা সাজ্ঘা ডিঙা। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন-

> "প্রত্যেক সাজ্ঘায় এক এক জন বুড়া পাটনি। আর মধুকর নামে যে ডিঙায় বিহারী দত্ত ও তাঁহার পরিবার ছিল, তাহার পাটনি এই সকল সাজ্ঘার কর্তা। প্রত্যেক সাজ্ঘার এক-একখানি ডিঙায় ১০০ জন করিয়া জোয়ান পুরুষ তীর (তির), ধনুক, ঢাল, তরবাল লইয়া ডিঙারক্ষা করিবার জন্য আছে। সব নৌকার খোলে মাল বোঝাই।"[৪৮]

বিহারীর নৌকাগুলি এক রকমের নয়। কোনটি হালের দিকে উঁচু, কোনটি ততটা উঁচু নয়। কোনটি প্রায় গোল। খোল ফাঁদালো, আগাগোড়া ছইয়ে ঢাকা, ছইগুলি বাখারির পাতা দিয়ে বাঁধা। চারপাশে এমন বাখারির বাঁধন। ছইয়ের নীচে অনেক কামরা, প্রতিটি কামরায় লম্বায় দু'টি করে জানালা, একটি করে দরজা। ছইয়ের উপর বড় মাচা, মাচার উপর ঘর। বৃদ্ধ মাঝি সারা সময় হাল ধরে বসে থাকেন। হালের আকৃতি মাছের লেজের মত। গভীর জল পর্যন্ত ডুবে থাকে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন –

> "হালের মাথায় একটি লোহার শিক বাঁধা। মাঝির হাতে সেই শিক। প্রত্যেক নৌকার দুই ধারে পিতলের দুইটা করিয়া বড়ো বড়ো চোখ। মাঝখানে বড়ো বড়ো বেনের নাম লিখা।"[৪৯]

সেকালে নৌকায় রাজা - রাজড়ারা বাচ খেলতেন। একটা নৌকা পালিয়ে যায়, আর একটা তার পিছন নেয়। প্রথমটিকে রক্ষা করার জন্য আর একখানা আসে। উপন্যাসে বড় বজরার উল্লেখ করেছেন হরপ্রসাদ। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে নৌসংস্কৃতি। এই উপন্যাসের সময়কাল প্রায় এগারোশ বৎসর পূর্বের। বিহারীও নৌযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। নবম-দশম-একাদশ শতাব্দীর কাহিনী। শাস্ত্রী মহাশয় উপন্যাসের শুরুতে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। লিখেছেন –

> "শকাব্দ ৯২২, সংবৎ ১০৫৭, ইস্ বি ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ, তিথি পূর্ণিমা, জায়গা সাতগাঁ গাজনের ভারি ধুম লাগিয়াছে।"[৫০]

এমন আশ্চর্য নৌসংস্কৃতির রূপময় উপহার বাংলা সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থের 'নৌকা ও জাহাজ' প্রবন্ধে বিভিন্ন নৌকার উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দোণা, দুণি, ডিঙি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ ও ময়ূরপঙ্খী। এছাড়া বড় নৌকার মধ্যে জাহাজের উল্লেখ করেছেন লেখক। কোন জাহাজে সাতশো লোক যেতেন বলে উল্লেখ করেছেন শাস্ত্রী মহাশয়। লিখেছেন –

> "চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের বারো শত দাঁড় ছিল।"[৫১]

সেই সেকালের নৌ-সংস্কৃতির একটা গৌরবময় অধ্যায়কে কালের কপোলতলে উজ্জ্বলন্ত করে রেখেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। আর রাজসভার অবাঙালি কবি বিদ্যাপতি তাঁর কবিতায় নৌশিল্পকে ব্যঞ্জিত অর্থ তাৎপর্যে সৌন্দর্যের স্বপ্নপুরী করে তুলেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নৌকা শিল্প মধ্যযুগে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের উচ্চতর সীমানা স্পর্শ করেছিল। লোকায়ত শিল্প খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। এক একটি লোকশিল্প অনেক দিন বেঁচে থাকে। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে সঙ্গী করে সংহত সমাজের সম্পত্তি হয়ে ওঠে। তবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভিঘাতে লোকশিল্প যায় হারিয়ে। সম্প্রদায়, বৃত্তি এবং জাতি অবস্থান বদলায়। ফলে লোকশিল্প তার ক্লাসিক বিশুদ্ধ রূপ হারিয়ে ফেলে। লোকশিল্পের বিকৃতি সাধন হয়। সময়ের অভিঘাতে ভেঙ্গে যায় গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও পাড়া। ঐতিহ্য হারিয়ে এভাবে অনেক লোকশিল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। কোন কোন শিল্প আজ একেবারে লুপ্ত। যেগুলো বেঁচে আছে, সেগুলি খাঁটি বিশুদ্ধ শিল্প নয়। নতুন কালের প্রলেপ পড়েছে সেখানে। বহুজাতিক সংস্কৃতির ছাপ থেকে গেছে এসব শিল্পে। চন্দ্রশেখর সাহা এবং মাশরুর মামুন মিথুন যথার্থই বলেছেন -

> "আজকে যে কলসী বা হাড়ি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার মাহাত্ম্য ধরতে না পারলে ভবিষ্যতের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। যেমনটি করতে হচ্ছে বা হবে আমাদের নৌশিল্প নিয়ে। কি অবিশ্বাস্য কারিগরী দক্ষতায় শিল্প আর লোকজ প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল 'ডিঙ্গি', 'বালাম', 'কোষা', 'ছিপ', 'বজরা', 'পানসি', 'সাম্পান' প্রভৃতি অজস্র ধরনের নৌকা, তা আজ স্মৃতির কোঠায় হারিয়ে যেতে বসেছে। 'বাইচ' নৌকার কথাই ধরা যাক। আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে এটি প্রযুক্তি, ডিজাইন ও নান্দনিকতার অপূর্ব সমন্বয়। বাংলাদেশে নৌকা নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করা ইভস মেয়ার দুঃখ করে বলেন যে, যখন এই বাইচ নৌকা সময়ের প্রভাবে এমন একটি অবস্থানে এসেছে যেখানে এর কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রয়োজন নেই বা সম্ভবও নয়, সেই ক্লাসিকতার রূপ আমরা ধরতে পারি না আর তা হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলাদেশের নৌকা সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে ডঃ এনামুল হক উচ্চকণ্ঠে এ সমস্ত 'ক্লাসিক' দ্রব্যের বিস্তৃত গবেষণার গুরুত্বের কথা বলেছেন।"[৫২]

সাগরতীর্থ হিন্দু নরনারীর পুণ্য ক্ষেত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নবকুমার নৌকাযোগে সাগর তীর্থে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তিনি পুণ্য অর্জনের জন্য নয় - সমুদ্র দেখার অভিলাষ তাঁর উদ্দেশ্য। আর রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের 'দেবতার গ্রাস' – কবিতায় পুণ্যার্থী মৈত্র মহাশয়ের তীর্থস্নানের উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গম যাত্রার ইচ্ছে প্রকাশ। ঘাটে দু'টি নৌকা প্রস্তুত। শুভক্ষণে দুর্গানাম স্মরণ করে নৌকা ছেড়ে দিল। তারপর সমুদ্র বক্ষে কি ঘটেছে পাঠক মাত্রেই জানেন। কবি লিখলেন -

"নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। ...
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা?,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা?"[৫৩]

প্রাচীন হিন্দুদের গৌরবময় নৌ-অভিযান আজ দূরতর স্মৃতি। প্রাচীন ভারতের নৌ-শিল্পের উত্তরাধিকার ও অতীত ঐতিহ্য আজ বিস্মৃত উপকথার মত সহৃদয় পাঠক স্মরণ করে। সমুদ্র যাত্রায় বাঙালিরা যে কত দক্ষ ছিলেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুর্শিদাবাদের 'বেরা উৎসব' খুবই জনপ্রিয়। এটি নৌ-সংস্কৃতির অংশ। বাঁশ আর কলাগাছে নির্মিত অপূর্ব আলোর ভেলা। এই ভেলার নাম 'বেরা'। কিন্তু এই ভেলাই সব নয়। তৈরি করা হয় ময়ূরপঙ্খী নৌকা। লাখো লাখো মোমবাতি ও যোজন বিস্তৃত আলো। ঝাড় লণ্ঠনে সাজানো নৌকা। সহস্র মানুষের ভিড়ে নদীবক্ষে হতো এই নৌ–উৎসব। হীরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "সেই প্রাচীন বিরাট উৎসবের ভগ্নাংশ এখন কোনও রকমে টিকে আছে।"[৫৪]

বাইচ নৌকা নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৌ-সংস্কৃতির অংশ। শত শত বছরের উত্তরাধিকার আহৃত নৌকা চালানোর দক্ষতাসূচক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এই নৌকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটি নিছক খেলা নয়, বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বাইচ নৌকার প্রতিযোগিতা হয়। এখানে নৌকায় মোটর ইঞ্জিন একান্তই নিষিদ্ধ। প্রতিটি নৌকায় ২৫ থেকে ১০০ জন মাঝি মাল্লা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বাংলার লোক উৎসবের এক অনন্য নিদর্শন বাইচ নৌকার প্রতিযোগিতা। নদী তীরবর্তী জনপদ হয়ে ওঠে মানুষের অরণ্য। বাংলার লোক উৎসবের গৌরবময় রোমাঞ্চকর নৌ-প্রতিযোগিতাটি আজ একান্ত লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির অংশ।

Reference:

১. মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মৎস্যপুরাণম্, প্রথম অধ্যায়, সম্পা. - শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৩

২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. - সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ২২৯

৩. মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্, দশমোহধ্যায়ঃ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ২১

৩.ক. C. Scott Littleton, Mythology (General Editor), Thunder Bay Press, San Diego, California, 2002, p. 7

৩.খ. ibid

8. H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal (Ethnographic Glossary), vol. II, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat press, 1892, pp. 287-288

৫. মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, সুন্দরকাণ্ড, সম্পা. - শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭১২

৬. মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, সম্পা. - আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ২৭০

৬.ক. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, প্রাচীন শিল্প - পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃ. ১৫৯ - উদ্ধৃতিটি উক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৬.খ. C. Scott Littleton, Mythology (General Editor), Thunder Bay Press, San Diego, California, 2002, p. 6

৭. গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, প্রাচীন শিল্প – পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬২

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. তদেব, পৃ. ১৬৩

১৩. তদেব

১৪. তদেব, পৃ. ১৬৪

১৫. মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ১৯২, সম্পা. -- মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭২০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, প্রাচীন শিল্প - পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৪ - গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

১৭. তদেব

১৮. তদেব, পৃ. ১৬৫

১৯. কালিদাস, রঘুবংশম্, ষোড়শঃ সর্গ, শ্লোক সংখ্যা – ৬৮, কালিদাসের রচনাবলী, সম্পা. – শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সারস্বত কুঞ্জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৪২২

১৯.ক. জানা, রঙ্গনকান্তি, পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক জলযান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ২০০৯, পৃ. ১৯ - ২২

২০. শ্রীভৈরব শাস্ত্রী ও জ্যোতিষ ভারতী শ্রীপরাশর কর্তৃক সম্পাদিত, সহজ বিশুদ্ধ জ্যোতিষ বিজ্ঞান, শ্রীগুরু পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২১৯-২২১

২১. তদেব

২২. তদেব

২৩. তদেব

২৪. তদেব

২৫. তদেব

২৬. তদেব

২৬.ক. ভোজ, মহারাজ, যুক্তিকল্পতরু, ভারতের নৌ-শিল্প, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ২৩ - গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

২৬.খ. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), ৭ মণ্ডল, ৮৮ সূক্ত, শ্লোক সংখ্যা - ৪, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭০

২৬.গ. মহর্ষি ব্যাসদেব, মহাভারতম্, আদিপর্ব (৩), সম্পা. – শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৫৪

২৬.ঘ. মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ১৫৮, সম্পা. - মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪০৯

২৭. চাটিল পাদ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ, ৫ সংখ্যক চর্যা, হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সম্পা. - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় – সাহিত্য - পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ৬৭

২৮. পূর্বোক্ত, কামলী – (কম্বলাম্বরপাদ), চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ, ৮ সংখ্যক চর্যা, পৃ. ৭২

২৯. পূর্বোক্ত, ডোম্বীপাদ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ, ১৪ সংখ্যক পদ, পৃ. ৮১

৩০. পূর্বোক্ত, ভুসুকুপাদ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ, ৪৯ সংখ্যক পদ, পৃ. ১৬৭

৩১. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অথ নৌকাখণ্ড, সম্পা. - বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৫৫

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৩৩. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, সম্পা. - শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৪৪

৩৪. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, সম্পা. - শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৮৭

৩৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সম্পা. - শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ড. আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১২১

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৭. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, সম্পা. - শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১১, পৃ. ৯২-৯৩
৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. - সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ২৩০
৩৯. তদেব
৪০. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার (সম্পা.) বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রকাশক - শ্রীশরৎকুমার মিত্র, ৮৫ নং গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা, পদসংখ্যা-৩৭, পৃ. ৩০
৪১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৪৯, পৃ. ৪০
৪২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫১, পৃ. ৪২
৪৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ২৪৯, পৃ. ১৭৩
৪৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৫১, পৃ. ২৩৪
৪৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫০৮, পৃ. ৩২৯
৪৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৮৬৭, পৃ. ৫২৮
৪৭. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, বেনের মেয়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (প্রথম খন্ড), সম্পা. - সত্যজিৎ চৌধুরী ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১২, পৃ. ২০৪ ৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯
৫১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, নৌকা ও জাহাজ, সম্পা. - জিসান হাবিব, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪২
৫২. সাহা, চন্দ্রশেখর ও মাসরুর মামুন মিথুন, দ্রব্যের অন্তরালে (Behind products), Published by Design and Technology Centre, 2004, Dhaka - 1213, Bangladesh, P. 10
৫৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দেবতার গ্রাস, কাহিনী (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯ – ৯৩
৫৪. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ (বজ্রমিত্র), বাংলার লোক – উৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় - সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১২৪